৪

শিল্প বিরোধ ও বিরোধ নিষ্পত্তি

Industrial Dispute & Dispute Resolution

=======

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ- ৪.১ : পাঠ- ৪.২ :	

পাঠ ৪.১ শিল্প বিরোধ ঃ প্রকৃতি

===

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিরোধ বা দ্বন্দ্ব কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- শিল্প বিরোধ ধারণাটির সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- শিল্প বিরোধের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প বিরোধের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন
- শিল্প বিরোধের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- শিল্প বিরোধ প্রকাশের ধরন বা পদ্ধতিসমূহ বলতে পারবেন
- শিল্প বিরোধের ধনাত্মক প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন
- শিল্প বিরোধের ঋণাত্মক প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন

সূচনা বক্তব্য

Preamble

মানব সভ্যতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগের কাল থেকে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। মালিক তার মুনাফা সর্বোচ্চ করতে চায় এবং এ লক্ষ্যে শ্রমিকদের মজুরি ও সুবিধা যত কম দিতে পারে সে চেষ্টা করে। অপর দিকে শ্রমিক যত বেশী মজুরি ও সুবিধা আদায় করতে পারে তার চেষ্টা করে। এই দুই বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাতের কারণে সৃষ্ট বিরোধ হলো শিল্প বিরোধ। পুঁজিবাদী সমাজে এই বিরোধ থাকবেই। কেননা,এই সমাজ ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে ও বল্গাহীন শ্রম শোষণ অব্যাহত রাখে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত শিল্প বিরোধ চলমান থাকবে। যা হোক, এখন আমরা দেখব বিরোধ কী?

বিরোধ বা দ্বন্দ্ব কী

What is Dispute or Conflict

আভিধানিক অর্থে দুই জন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে তীব্র মত পার্থক্য দেখা দিলে তাকে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব বলে। মানব সমাজে মত পার্থক্য স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের উপলব্ধি, মনোভাব, অর্জিত জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের কারণে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে এক ব্যক্তির বা গোষ্টির চিন্তা, মত ও ব্যাখ্যা নিয়ে অন্য এক ব্যক্তি বা গোষ্টির চিন্তা, মত ও ব্যাখ্যার পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু এটিকে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব বলা যায় না। যার যার মত নিয়ে যখন ব্যক্তি বা গোষ্টি অনঢ় অবস্থান নেয় ও তীব্র যুদ্ধংদেহী আচরণ করে, তখন সেই সম্পর্কগত অবস্থাকে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব বলা হয়।

শিল্প বিরোধ বলতে কি বোঝায়

What is meant by the Industrial Dispute

একটি শিল্প অনেকগুলো সমজাতীয় পণ্য বা সেবা উপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত হয়। প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকে শ্রমিক,মালিক বা ব্যবস্থাপনা। একই সঙ্গে জড়িত থাকে শ্রমিক সংঘ,মালিক সমিতি ও সরকার। সাধারণ ভাবে শ্রমিক ও মালিক বা ব্যবস্থাপনার মধ্যস্থিত নিয়োগ শর্ত, কার্য পরিবেশ, শ্রমিকের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে বিরোধকে শিল্প বিরোধ বলা হয়। তবে, শিল্প বিরোধের আইনগত সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ এর ধারা ১(৬২)তে শিল্প বিরোধের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,"শিল্প বিরোধ অর্থ কোন ব্যক্তির নিয়োগ সংক্রান্ত বা নিয়োগের শর্তাবলী সংক্রান্ত বা কাজের অবস্থা সংক্রান্ত বা পরিবেশ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও নিয়োগকর্তা, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক বা

শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন বিরোধ বা মত পার্থক্য"। তা হলে দেখা যাচ্ছে, নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে আন্তঃবিরোধ বা অন্তঃবিরোধ দেখা দিতে তা হবে শিল্প বিরোধ।
এবার আমরা শিল্প বিরোধের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প বিরোধের প্রকৃতি

Nature of Industrial Dispute

শিল্প বিরোধের প্রকৃতি বা স্বরুপ কি তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **শিল্প বিরোধ একটা ব্যক্তিক বা গোষ্টি বিরোধ ঃ** বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ এর ধারা ১(৬২) অনুসারে শিল্প বিরোধ হলো কোন ব্যক্তির নিয়োগ সংক্রান্ত বা নিয়োগের শর্তাবলী সংক্রান্ত বা কাজের অবস্থা সংক্রান্ত বা পরিবেশ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও নিয়োগকর্তা, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক বা শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন বিরোধ বা মত পার্থক্য। এই মত পার্থক্য ব্যক্তিগত ভাবে দুই জন ব্যক্তির মধ্যে হতে পারে, যেমন ব্যক্তি শ্রমিক ও ব্যক্তি মালিকের মধ্যে সংঘটিত বিরোধ শিল্প বিরোধ হবে। আবার দুইটি সংঘের মধ্যে হতে পারে , যেমন শ্রমিক সংঘ ও মালিক সমিতি বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে সংঘটিত বিরোধ শিল্প বিরোধ হবে। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, শিল্প বিরোধ একটা ব্যক্তিক বা গোষ্টি বিরোধ।

২। **শিল্প বিরোধের বিষয় হলো নিয়োগ ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত ঃ** শিল্প বিরোধের বিষয়বস্তু অবশ্যই নিয়োগ সংক্রান্ত বা নিয়োগের শর্তাবলী সংক্রান্ত বা কাজের অবস্থা সংক্রান্ত বা পরিবেশ সংক্রান্ত হতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ অনুসারে নিয়োগ ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে শিল্প বিরোধ হতে পারবে না।

৩। **শিল্প বিরোধ আনুষ্ঠানিক শিল্পে হতে হবে ঃ** কোন মত পার্থক্যকে শিল্প বিরোধ হিসেবে গণ্য হতে হলে তা প্রধানতঃ নিবন্ধিত আনুষ্ঠানিক সংগঠনে সংঘটিত হতে হবে। তবে, বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ -তে লিখিত কারখানার সংজ্ঞায় বর্ণিত কর্মকান্ড অনানুষ্ঠানিক ভাবে সংঘটিত হলে এবং সেখানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে নিয়োগ ও কার্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা শিল্প বিরোধ হিসেবে গণ্য হবে।

৪। **শিল্প বিরোধ কেবল মালিক বা যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট তুলতে পারে ঃ** বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ - এর ধারা ২০৯ অনুসারে কোন শিল্প বিরোধ বিদ্যমান আছে বলে গণ্য হবে না যদি না এটি ১৫-অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক কোন মালিক বা যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট কর্তৃক উত্থাপিত না হয়। এ থেকে পরিস্কার হলো যে, শুধু মালিক বা যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট ছাড়া অন্য কোন পক্ষ শিল্প বিরোধ উত্থাপন করতে পারবে না।

৫। **শিল্প বিরোধ এইটা বহুপাক্ষিক বিরোধ ঃ** বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ - এর বিধান মতে নিয়োগকর্তা ও নিয়োগকর্তা, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক বা শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন বিরোধ বা মত পার্থক্য হলে তা হবে শিল্প বিরোধ। সুতরাং এখানে ব্যক্তি মালিক, ব্যক্তি শ্রমিক, শ্রমিক সংঘ, মালিক সমিতি ইত্যাদি বহু পক্ষ জড়িত আছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত নিয়োগ সংক্রান্ত বা নিয়োগের শর্তাবলী সংক্রান্ত বা কাজের অবস্থা সংক্রান্ত বা পরিবেশ সংক্রান্ত কোন বিরোধ দেখা দিলে তা হবে শিল্প বিরোধ।

৬। **শিল্প বিরোধ একটা চলমান বিরোধ ঃ** মালিক শ্রমিকদের মজুরি ও সুবিধা কম দিয়ে তার মুনাফা সর্বোচ্চ করতে চায়। অপর দিকে শ্রমিক যত বেশী পারে মজুরি ও সুবিধা আদায় করতে চায়। এই দুই বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাত চলছে এবং চলবে। বুর্জোয়া সমাজে এই দ্বন্দ্ব চিরকাল থাকবে। সে কারণে শিল্প বিরোধ একটা চলমান বিরোধ।

এবার শিল্প বিরোধের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্প বিরোধের প্রকারভেদ

Types of Industrial Dispute

শিল্প বিরোধ যে বিষয় নিয়ে উদ্ভুত হয় তার ভিত্তিতে শিল্প বিরোধকে দুই প্রকার বলা হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

১। অধিকার সংক্রান্ত শিল্প বিরোধ

অধিকার হলো ন্যায্য পাওনা,আইনগত দাবী বা এমন কিছু যা একজন ব্যক্তি করতে পারে বা পেতে পারে। আমরা জানি কোন ব্যক্তি বা শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে একটি নিয়োগ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদান করেন। এই চুক্তিতে বিধৃত শর্তাবলী অনুসারে নিয়োগকৃত ব্যক্তি যা পেতে পারে তা তার অধিকার। এ ছাড়া, যৌথ চুক্তি, শ্রম আইন, শ্রম বিধিবিধান, ও সাংবিধানিক আইন দ্বারা প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো শ্রমিকের অধিকারের মধ্যে পড়বে। এই অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধ হলো অধিকার সংক্রান্ত শিল্প বিরোধ।

২। স্বার্থ সংক্রান্ত শিল্প বিরোধ

স্বার্থ হলো এমন কিছু বিষয় যা নিয়ে একজন মানুষ উদ্বিগ্ন হন অথবা যে সম্পর্কে তিনি প্রবল উৎসাহ অনুভব করেন। নতুন কোন বিষয় যা একজন শ্রমিক পেতে পারে বলে প্রবল ভাবে বিশ্বাস করে বা এমন কোন বিষয় যা একজন শ্রমিক এখন পায় না কিন্তু যা শ্রমিক মনে করে তার পাওয়ার যৌক্তিক কারণ রয়েছে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে একজন শ্রমিকের পাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তবে সেগুলো স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মজুরি বৃদ্ধি পাওয়া, পদোন্নতি পাওয়ার নির্দিষ্ট বিধি, নতুন কাজের জন্য বা কাজের মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ লাভ, চাকুরিচ্যুতি বা সাময়িক ছাঁটাই সংক্রান্ত বিষয়, শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। এই সব স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধ হলো স্বার্থ সংক্রান্ত শিল্প বিরোধ।

এবার শিল্প বিরোধের কারণসমূহনিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্প বিরোধের কারণসমূহ

Causes of Industrial Dispute

শিল্প বিরোধ দেখা দেয়ার প্রধান দুটো কারণ হলো শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে শিল্প বিরোধের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সব কারণে শিল্প বিরোধ হয়, সেগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **অর্থনৈতিক কারণ ঃ** মানুষ পরিবার নিয়ে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান লাভের লক্ষ্যে কাজ করে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, একজন শ্রমিকের মজুরি ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থান সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে প্রধানতঃ শিল্প বিরোধ দেখা দেয়।অর্থনৈতিক কারণগুলোর মধ্যে ন্যায্য মজুরি, বোনাস,ওভারটাইম, উৎসাহ ভাতা, উৎসব ভাতা, চাকুরির নিরাপত্তা, মূল্যস্ফীতির সাথে তাল রেখে মজুরি বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনার ইচ্ছা মত চাকুরিচ্যুতি ও ছাঁটাই না করা, মহার্ঘ ভাতা, দুর্ঘটনার যথাযথ ক্ষতিপূরণ ইত্যাদিসহ শ্রম আইন ও অন্যান্য বিধিতে প্রদত্ত সকল সুবিধা অর্থনৈতিক সুবিধার মধ্যে পড়ে। শ্রমিকেরা এগুলো ঠিক মত ও সঠিক সময়ে না পেলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে ও ব্যবস্থাপনার সাথে শিল্প বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।

২। **মনস্তাত্বিক কারণ ঃ** মালিক ও শ্রমিক পক্ষ ঐতিহাসিক ভাবে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে। পরস্পরকে অবিশ্বাস করে। শ্রমিকরা মালিক বা ব্যবস্থাপকদেরকে শ্রম শোষক, নিযার্তনকারী ও শ্রমস্বার্থের প্রতি অবহেলাকারী শত্রু মনে করে। আবার মালিক বা ব্যবস্থাপকরা শ্রমিকদের ফাঁকিবাজ, কাজের প্রতি অবহেলাকারী, সংগঠনের প্রতি অঙ্গীকারহীন, অশিক্ষিত, মূর্খ, ছোটলোক ইত্যাদি মনে করে অবজ্ঞা করে। এছাড়া, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য, প্রেষণা ও প্রত্যাশার পার্থক্য, সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিপরীতমুখী ভ্রান্ত ধারণা, সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগে অনীহা, শ্রমিকদের মানসিক চাহিদা পূরণে ব্যবস্থাকীয় অদক্ষতা ও অনীহা ইত্যাদি কারণে মনস্তাত্বিক দুরত্ব ও সংঘাত দেখা দেয়। আঞ্চলিকতা মনোভাবের কারণে শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ সকল মনস্তাত্বিক কারণে শিল্প বিরোধ দেখা দেয়।

৩। **সামাজিক কারণ ঃ** সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা থাকলে এবং শ্রমজীবী মানুষের গ্রহণযোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা না দেয়ার মূল্যবোধ থাকলে তা শ্রমজীবী মানুষের মনে ক্ষোভ সঞ্চার করে। এই সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের কারণে ধনিক শ্রেণী ও লুটেরা ধনিক শ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণা ও জিঘাংসা তৈরি হয়। বিশেষ করে সামন্ত সমাজ ও বুর্জোয়া সমাজে এই অবস্থা প্রকট ভাবে বিরাজ করে। সমাজ শ্রমজীবী মানুষকে মর্যাদা দেয় না, শ্রমের সামাজিক স্বীকৃতি দেয় না, বরং তাদের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। ফলে, শ্রমিকেরা হীন মনোবল সম্পন্ন হয়ে পড়ে ও সুবিধাবাদী শোষক শ্রেণীর প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে পড়ে। এ সকল সামাজিক কারণে শ্রমিকেরা মালিক বা ব্যবস্থাপকদের

ধনিক শ্রেণী ও লুটেরা ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি মনে করে তাদেরকে শ্রেণী শত্রু হিসেবে গণ্য করে এবং তা শিল্প বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪। **রাজনৈতিক কারণ ঃ**দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা শিল্প বিরোধের একটি অন্যতম কারণ। স্বৈরতান্ত্রিক , অগণতান্ত্রিক, সামরিক ইত্যাদি সরকার দেশে থাকলে শ্রমিকরা তাদের অধিকার পায় না। বরং ন্যায্য দাবী ও শ্রমিক সংঘ করার অধিকার চাইলে নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়। দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকলে, জ্বালাওপোড়াও অবস্থা থাকলে, সরকার আসে সরকার যায় অবস্থা থাকলে,সবার আগে ক্ষতিগ্রস্থ হয় শ্রমিক সমাজ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি ও শত্রুতা থাকলে শ্রমজীবী মানুষ অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে। তাছাড়া, শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক দলের অধীনে চলে গেলে তাদের এজেন্ডা অনুসারে শিল্পে অস্থিরতা দেখা দেয়। কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির সংগে সহমর্মীতা দেখিয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট বা বন্ধ পালন করতে পারে। অন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় অবিচার হতে দেখলে শ্রমিকেরা অন্দোলনে যেতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায় রাজনৈতিক অবস্থাও শিল্প বিরোধের কারণ হতে পারে।

৫। **কারিগরি কারণ ঃ**শিল্প কারখানায় নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করতে চাইলে শ্রমিকেরা চাকুরি হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। কাজের সাথে খাপ খায় না এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বাধ্য করলে শ্রমিকেরা উৎপাদন কম করার ঝুঁকিতে পড়ে ও তাদের মধ্যে আয় কমে যাওয়ার আতঙ্ক বিরাজ করে। এ অবস্থায় শ্রমিকেরা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাছাড়া, স্বাস্থ্য সম্মত ও নিরাপদ কার্য পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলে শ্রমিকেরা জীবন আশঙ্কার মুখে পড়ে। এ সকল প্রযুক্তিগত কারণ শেষ পর্যন্ত শিল্প বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৬। **আইনগত কারণ ঃ**দেশের শিল্প আইন, দেওয়ানি আইন, সংবিধান, কনভেনশন,আদালতের রায় ,আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ও অধিকার মালিক বা ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন না করলে বা বাস্তবায়ন করতে গড়িমসি করলে শিল্প বিরোধ দেখা দেয়। কর্মীদের পদোন্নতি, বদলি, প্রশিক্ষণে প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করলে শিল্প বিরোধ দেখা দেয়। তাছাড়া, নিজ প্রতিষ্ঠানে, অন্য প্রতিষ্ঠানে বা দেশে কোন অবিচার ঘটলে বা বৈষম্যমূলক কর্মকান্ড হলে তার ন্যায্য বিচার ও অপ্রতুল আইনগত ব্যবস্থা থাকলে তার সংশোধন বা শ্রম স্বার্থ রক্ষাকারী আইন না থাকলে তা প্রবর্তন করা ইত্যাদি আইনগত কারণে শিল্প বিরোধ দেখা দেয়।

৭। **বাজার সংক্রান্ত কারণ ঃ** বাজার অবস্থার কারণে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে যা শিল্প বিরোধে রূপান্তরিত হয়। যেমন, বাজারে যদি দ্রব্য মূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, তবে শ্রমিকদের বর্তমান মজুরিতে জীবন মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কারখানার কাঁচামালের সরবরাহ কমে গেলে উৎপাদন ব্যাহত হয় ও শ্রমিকেরা চাকুরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়ে। শ্রম বাজারে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত মানব সম্পদ পাওয়া না গেলে, প্রতিষ্ঠানের বাজার হারানোর ঝুঁকি থাকে এবং শ্রমিকেরা চাকুরির নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে। এ সব অবস্থা শিল্প বিরোধের কারণ হয়।

৮। **অন্যান্য কারণ ঃ** উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়া অন্যান্য কতকগুলো কারণে শিল্প বিরোধ দেখা দিতে পারে। যেমন, দক্ষ ও পেশাজীবী ব্যবস্থাপকের অভাব, ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করতে না দেয়া, কার্য পরিবেশের উন্নতি না করা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা না করা, পরিবেশের ক্ষতি সাধন বন্ধ না করা ইত্যাদি কারণে শিল্প বিরোধ হতে পারে।

এবার আমরা শিল্প বিরোধ প্রকাশের ধরন বা পদ্ধতিসমূহ কি কি তা দেখব।

শিল্প বিরোধ প্রকাশের ধরন বা পদ্ধতিসমূহ

Forms or Methods of Expressing Industrial Dispute

শিল্প বিরোধ প্রকাশ করার জন্য দেশে দেশে শ্রমিক সংঘ ও ব্যবস্থাপনা নানা ধরন বা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। যে ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিক বা শ্রমিক সংঘ বা ব্যবস্থাপনা যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়ার মধ্যে চাপ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে একতরফা ভাবে স্বাভাবিক কাজকর্ম অস্থায়ী ভাবে স্থগিত করে,সে ধরনের কার্যক্রমকে শিল্প বিরোধ প্রকাশের ধরন বা পদ্ধতি বলে। ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের এই কার্যক্রমকে আবার শিল্প কর্মকান্ড (Industrial Action)বলা হয়। এই কর্মকান্ডগুলো নিচের ছকে দেখানো হলো।

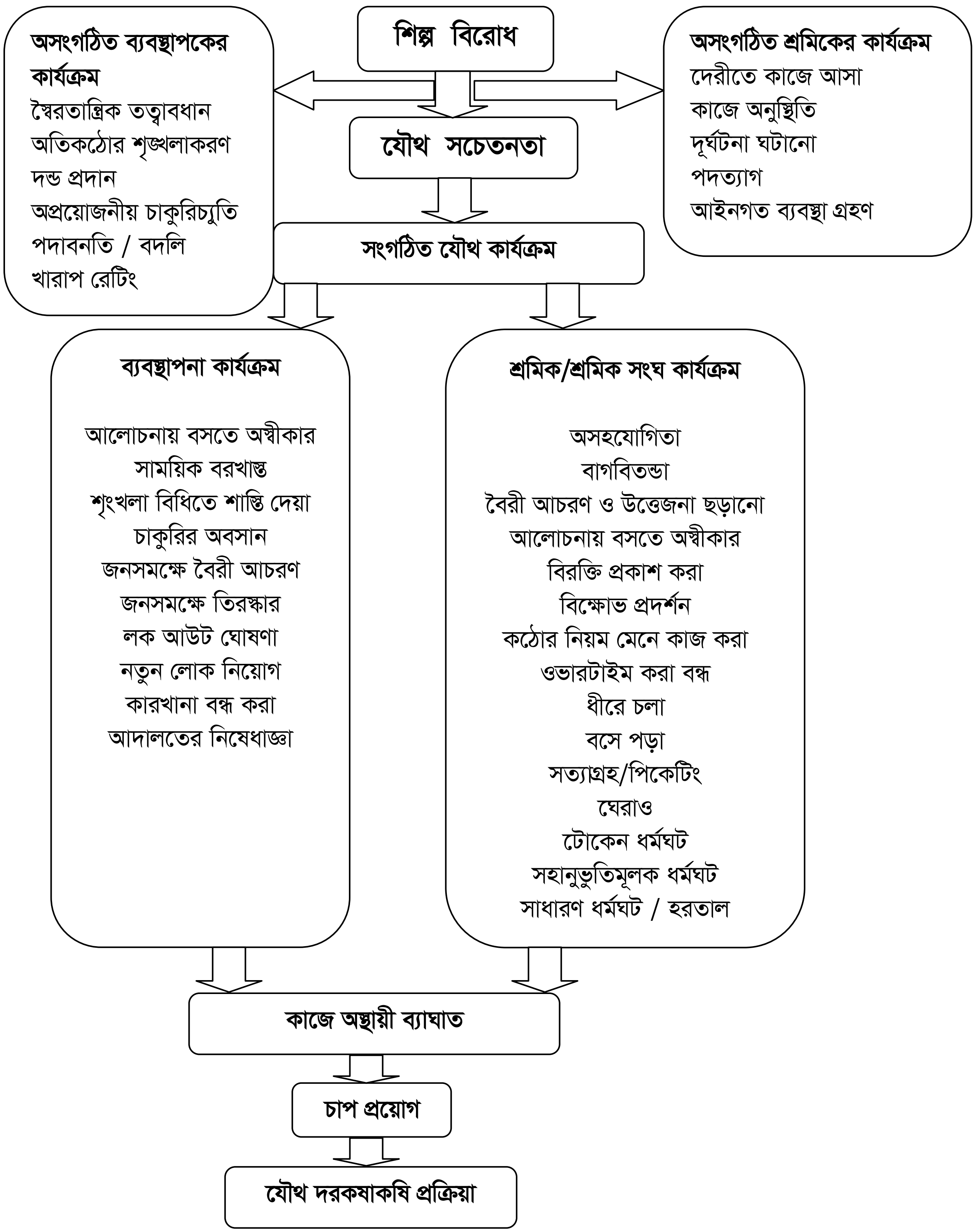

এবার আমরা শিল্প বিরোধের ধণাত্মক ও ঋণাত্মক প্রভাবনিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প বিরোধের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রভাব

Positive and Negative Impacts of Industrial Dispute

দ্বন্দ্ব বা বিরোধ সব সময় খারাপ ফল দেয় না। কোন কোন সময় ভাল ফল দেয়। সে কারণে দ্বন্দ্বকে উৎপাদনশীল দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ও ধ্বংসাত্মক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ বলে দুই ভাবে চিহ্নিত করা হয়। শিল্প বিরোধও ভালো ফলদায়ক ও মন্দ ফলদায়ক হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে নিচের আলোচনা।

ক) শিল্প বিরোধের ধনাত্মক প্রভাব [Positive Impacts of IndustrialDispute]

শিল্প বিরোধের ভাল ফল হলো -

১) **উদ্ভাবন, সৃষ্টিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি আনে ঃ** শিল্প বিরোধ মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বা বিরোধের বিষয় নিয়ে নানা উপায় উদ্ভাবন করতে ও নানা সৃষ্টিশীল পন্থা খুঁজে পেতে সাহায্য করে। কথা ও চিন্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে এগুলোর উৎপত্তি হয় এবং দেখা যায় গৃহীত সমাধান শিল্পের প্রবৃদ্ধি ঘটায়।

২) **গঠনমূলক উন্নত সিদ্ধান্ত আনে ঃ** শিল্প বিরোধে নিয়োজিত পক্ষগণ যার যার শ্রেষ্ঠ চিন্তা, বক্তব্য ও যুক্তি হাজির করে বলে শেষ পর্যায়ে সার্বিক বিচারে উভয় পক্ষের কাছে সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে গঠনমূলক উন্নত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে।

৩) **সমস্যার বিকল্প সমাধান বের করে ঃ** কোন বিষয় নিয়ে যত বেশী বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্ক করা হয়, সে বিষয় মোকাবেলা করার জন্য তত বেশী নানামুখী উপায় বের হয়ে আসে। ফলে প্রাথমিক ভাবে সমস্যার যে একমুখী সমাধান ভাবা হচ্ছিল, তার জায়গায় সমস্যার বহু বিকল্প সমাধান বের হয়ে আসে। তখন সেরা বিকল্প বেছে নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

৪) **সাধারণ সমস্যার সামগ্রিক ও সমুন্নত সমাধান পাওয়া যায় ঃ** মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সাধারণ সমস্যা নিয়ে শিল্প বিরোধ হলে উভয় পক্ষই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে কল্যাণকর সমাধান খোঁজে যা প্রতিষ্ঠান, মালিক ও শ্রমিক সকলেরই কল্যাণ আনে। ফলে, সাধারণ সমস্যার সামগ্রিক ও সমুন্নত সমাধান পাওয়া যায়।

৫) **ব্যক্তিক ও দলীয় পারদর্শিতা বাড়ায় ঃ** শিল্প বিরোধের যে কোন সমাধান ব্যবস্থাপনাসহ ব্যক্তি শ্রমিক ও শ্রমিক সংঘের উপর অগ্রসর পারদর্শিতার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করে। ফলে, তাদের নিজেদের স্বার্থে সকল পক্ষই তাদের কার্যপারদর্শিতা বাড়ানোর চেষ্টা করে এবং প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়।

৬) **নতুন পথে চিন্তা করতে বাধ্য করে ঃ** শিল্প বিরোধ প্রচলিত ধারায় চিন্তা করে অনেক সময় সমাধান করা যায় না। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে বিরোধের পক্ষগণকে নতুন পথে চিন্তা করতে বাধ্য করে ও তার ফলে সর্বাধুনিক সমাধানও পাওয়া যায়।

৭) **পক্ষগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ায় ঃ** শিল্প বিরোধ পক্ষগণকে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তা করার ও কথাবর্তা বলার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করে। আবার সমঝোতা চুক্তির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজ নিজ অঙ্গীকার পূরণ করার ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করে। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, শিল্প বিরোধ পক্ষগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ায়।

৮) **পক্ষগণের মধ্যে সমন্বিত ধারা বয়ে আনে ঃ** শিল্প বিরোধ মিমাংসা হলে পক্ষগণের মধ্যে একটা ঐক্যতান গড়ে ওঠে। ফলে, পক্ষগণের মধ্যে কাজের ও চিন্তার একটা সমন্বিত ধারা আসে এবং প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে।

খ) শিল্প বিরোধের ঋণাত্মক প্রভাব [Negative Impacts of Industrial Dispute]

শিল্প বিরোধের খারাপ ফল হলো -

১) **মানসিক চাপ, অসন্তুষ্টি ও অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে ঃ** শিল্প বিরোধ মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষ করে শ্রমিক পক্ষের মধ্যে বিরাট মানসিক চাপ, অসন্তুষ্টি ও অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে। ফলে, উত্তেজনা বাড়ে, কর্ম ব্যাহত হয়।

২) **পক্ষগণের মধ্যে যোগাযোগে অবনতি ঘটায় ঃ** মালিক ও শ্রমিক সকল প্রতিষ্ঠানেরই সহগামী শক্তি। দুই পক্ষই এক যোগে কাজ করে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য আনে। অথচ, পরস্পরের মধ্যে ক্ষুব্ধ মনোভাবের কারণে সৃষ্ট শিল্প বিরোধ পক্ষগণের মধ্যে যোগাযোগের অবনতি ঘটায়। ফলে, বিরোধ আরও বেড়ে যায়।

৩) **সম্পর্ক নষ্ট করে ও কার্যপারদর্শিতা কমায় ঃ** শিল্প বিরোধের ফলে পক্ষগণ উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ থাকে বলে পারস্পারিক সম্পর্ক নষ্ট হয় ও অনিশ্চিত অবস্থার কারণে ব্যক্তি কর্মচারির কার্য পারদর্শিতা কমতে থাকে।

৪) **পরিবর্তনে বাঁধা বাড়ে ঃ** সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষে সম্মিলিত চেষ্টায় সফল হয়। শিল্প বিরোধের ফলে শ্রমিক পক্ষ ক্ষুব্ধ থাকায় পরিবর্তন আনার পথে প্রবল বাঁধা সৃষ্টি করে।

৫) **সাংগঠনিক অঙ্গীকার ও আনুগত্য কমায়ঃ** শিল্প বিরোধ শ্রমিকদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তারা ব্যবস্থাপনার প্রতি বিরক্ত ও বৈরী হয়ে পড়ে। ফলে, তাদের সাংগঠনিক অঙ্গীকার ও আনুগত্য কমে যায়। যা শেষ পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন কমিয়ে দেয়।

৬) **পার্থক্য বাড়ায় ও মতৈক্য কমায় ঃ** শিল্প বিরোধ মালিক ও শ্রমিকদের পারস্পারিক বৈরী করে ও তাদের মধ্যে অবিশ্বাস ও আস্থা কমে যায়। ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য বাড়ায় ও মতৈক্য কমায়। বিরোধ আরও বাড়ে।

৭) **বিষয়কে দুর্বোধ্য করেঃ** শিল্প বিরোধ শ্রমিক ও মালিক পক্ষকে শত্রুতে পরিণত করে, যোগাযোগ হ্রাস করে ও পরস্পরের মধ্যে দুরত্ব বাড়ায়। ফলে, বিরোধীয় বিষয় ক্রমান্বয়ে দুর্বোধ্য ও জটিল করে তোলে।

৮) **ভুল বোঝাবুঝি ও পক্ষপাত বাড়ায়ঃ** শিল্প বিরোধ আবেগজনিত সমস্যা তৈরি করে ও যোগাযোগ হ্রাস করে। ফলে, পরস্পরের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি ও নিজেদের অবস্থানের প্রতি পক্ষপাত বাড়ে। দেয়া-নেয়ার মনোভাব তিরোহিত হয় এবং সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৯) **আবেগ জনিত সমস্যা বাড়ায়ঃ** শিল্প বিরোধের একটা ক্ষতিকর দিক হলো মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের মধ্যে আবেগ জনিত সমস্যা বাড়ায়। ফলে. যৌক্তিক অবস্থান নেয়া সম্ভব হয় না।

১০) **অবিশ্বাস ও সন্দেহপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেঃ** শিল্প বিরোধ শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে বৈরী অবস্থা বৃদ্ধি করে। ফলে পরস্পরের আস্থার ভাব চলে যায়। প্রতিষ্ঠানে অবিশ্বাস ও সন্দেহপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সারসংক্ষেপঃ

মানব সভ্যতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগের কাল থেকে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাতের কারণে সৃষ্ট বিরোধ হলো শিল্প বিরোধ।শিল্প বিরোধ একটা ব্যক্তিক বা গোষ্টি বিরোধ, শিল্প বিরোধের বিষয় হলো নিয়োগ ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত , শিল্প বিরোধ আনুষ্ঠানিক শিল্পে হতে হবে, শিল্প বিরোধ কেবল মালিক বা যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট তুলতে পাওে, শিল্প বিরোধ এইটা বহুপাক্ষিক বিরোধ, শিল্প বিরোধ একটা চলমান বিরোধ। শিল্প বিরোধ দুই প্রকার ঃ অধিকার সংক্রান্ত শিল্প বিরোধও স্বার্থ সংক্রান্ত শিল্প বিরোধ। শিল্প বিরোধের কারণসমূহের মধ্যে অর্থনেতিক কারণ, মনস্তাত্বিক কারণ , সামাজিক কারণ , রাজনৈতিক কারণ, কারিগরি কারণ , আইনগত কারণ বাজার সংক্রান্ত কারণ অন্যতম। শিল্প বিরোধ প্রকাশের নানা ধরন বা পদ্ধতি আছে। শিল্প বিরোধের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রভাব রয়েছে। শিল্প বিরোধের ভাল ফল হলো উদ্ভাবন, সৃষ্টিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি আনে , গঠনমূলক উন্নত সিদ্ধান্ত আনে, সমস্যার বিকল্প সমাধান বের করে, সাধারণ সমস্যার সামগ্রিক ও সমুন্নত সমাধান পাওয়া যায় ইত্যাদি। আর শিল্প বিরোধের খারাপ ফল হলো মানসিক চাপ, অসন্তুষ্টি ও অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি কওে, পক্ষগণের মধ্যে যোগাযোগে অবনতি ঘটায় , সম্পর্ক নষ্ট করে ও কার্য পারদর্শিতা কমায়, পরিবর্তনে বাঁধা বাড়ে, সাংগঠনিক অঙ্গীকার ও আনুগত্য কমায় ইত্যাদি।

পাঠ ৪.২ বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ কৌশল ও পদ্ধতি

===

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিরোধ বা দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করার কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- শিল্প বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রাতিষ্ঠানিক উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন
- বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার জন্য ইশারা বা টিপস্গুলো বর্ণনা করতে পারবেন

সূচনা বক্তব্য

Preamble

মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাতের কারণে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে তীব্র মত পার্থক্য হয় তাকে শিল্প বিরোধ বলে। শিল্প বিরোধ মিমাংসা করার নানা কৌশল ও পদ্ধতি আছে। এই পাঠে বিরোধ নিষ্পত্তির কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রথমে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করার কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বিরোধ বা দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করার কৌশলসমূহ

Dispute or Conflict   Handling Strategies

যে কোন বিরোধের বা দ্বন্দ্বের ন্যূনতম দু'টি পক্ষ থাকে। আবার বহু পাক্ষিক দ্বন্দ্বও হতে পারে। তবে, শিল্প দ্বন্দ্ব বা বিরোধে এক পক্ষ থাকে মালিক বা ব্যবস্থাপনা পক্ষ,আর অপর পক্ষ থাকে শ্রমিক বা শ্রমিক সংঘ। এই দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করার পাঁচটি কৌশল বিশেষজ্ঞগণ সুপারিশ করেছেন (রহিম ও বনোমা, ১৯৭৯)। এই কৌশল যে কোন এক পক্ষের প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থাপনা বা মালিক পক্ষের দিক থেকে বিরোধের বা দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু বিচার করে কৌশলগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করব। এটি শ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকেও বিচার করলে একই হবে।

বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি কৌশলসমূহ

(১) **একীভুতকরণ কৌশল (Integrating Strategy) ঃ** বিরোধ বা দ্বন্দ্ব মোকাবেলার একীভুতকরণ কৌশলে উভয় পক্ষের স্বার্থের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বা সুবিধা অর্জিত হয় এমন একটা সমাধান বের করার মাধ্যমে বিরোধ দ্বন্দ্ব নিরসন করা হয়। সমাধানটি এমন হবে যা উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।যে সকল শিল্প দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু জটিল থাকে, বিষয়টি মালিক পক্ষের একক সামর্থ্যের দ্বারা সমাধান করা যাবে না, বিষয়টি সমাধানে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের সমন্বিত বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি জ্ঞান দরকার, বিষয়টি উভয় পক্ষের সাধারণ সমস্যা হওয়ায় তা সমাধানে সকলের সম্পদ একত্র করা দরকার, বা বিরোধের বা দ্বন্দ্বের সমাধান বাস্তবায়নে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের অঙ্গীকার লাগবে, তখন মালিক পক্ষের কাছে একীভুতকরণ কৌশল ব্যবহার করা ছাড়া বিকল্প থাকে না।

(২) **কৃতার্থকরণ কৌশল (Obliging Strategy) ঃ** বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির কৃতার্থকরণ কৌশলে এক পক্ষ অপর পক্ষের স্বার্থ পরিপূরণে সহায়তা হয় এমন একটা সমাধান গ্রহণ করে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিরসন করে। এই কৌশলে এক পক্ষ অপর পক্ষকে সুবিধা ছেড়ে দিয়ে তাকে কৃতার্থ করে। সমাধানটি এমন হবে যা এক পক্ষের স্বার্থ উদ্ধার হলেও অপর পক্ষ তা মেনে নেয়। যেমন, শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষের দাবী মেনে নিল। ফলে, শ্রমিক পক্ষ মালিক পক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ হলো। যে সকল দ্বন্দ্বে মালিক পক্ষ ভুল বা দুর্বল অবস্থানে থাকে, দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু শ্রমিক পক্ষের কাছে খুবই গুরুত্বপর্ণ হলেও মালিক পক্ষের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, মালিক পক্ষ মনে করে শ্রমিক পক্ষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরী, বা মালিক পক্ষ এই বিরোধে শ্রমিক পক্ষকে ছাড় দিয়ে পরে বড় কোন সুবিধা পাওয়ার আসা করে, তখন মালিক শিল্প বিরোধ নিরসনে কৃতার্থকরণ কৌশল ব্যবহার করে লাভবান হয়।

(৩) **দমনকরণ কৌশল (Dominating Strategy) ঃ** বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির দমনকরণ কৌশলে মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে হুমকি-ধামকির মাধ্যমে তার নিজের স্বার্থ পরিপূরণে সহায়তা হয় এমন একটা সমাধান গ্রহণ করতে শ্রমিক পক্ষকে বাধ্য করে। ফলে, বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিরসন হয়। সমাধানটি এমন হবে যা এক পক্ষের স্বার্থ সর্বোচ্চ হবে, তবে অপর পক্ষের স্বার্থ কিছুটা হলে অর্জিত হবে বা একেবারেই হবে না। তবে, সকল ক্ষেত্রে এই কৌশল ব্যবহার করা যায় না। শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে যে সকল দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের ক্ষুদ্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, বিরোধ সমাধানে মালিক পক্ষ দ্রুত সিদ্ধান্ত চায়, বিরোধের বিষয়বস্তুর কারিগরি জ্ঞান শ্রমিক পক্ষের নেই, শ্রমিক পক্ষের কাছে অজনপ্রিয় এমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে, শ্রমিক পক্ষ যে বিরোধ নিষ্পত্তির যে প্রস্তাবনা দিয়েছে তা মালিক পক্ষের কাছে ব্যয়বহুল হবে, বা সমাধানটি মালিক পক্ষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তখন দমনকরণ কৌশল ব্যবহার করে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিরসন করলে মালিক পক্ষ লাভবান হয়।

(৪) **এড়িয়ে চলা কৌশল (Avoiding Strategy) ঃ** বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি বা মোকাবেলার এড়িয়ে চলা কৌশলে এক পক্ষ বা উভয় পক্ষই দ্বন্দ্বের বিষয় এড়িয়ে চলে সমস্যার আপাতঃ সমাধান করে। সাধারণতঃ দেখা যায়, এক পক্ষ অপর পক্ষের সাথে কোন দ্বান্দ্বিক অবস্থায় যেতে না চাইলে এই কৌশল ব্যবহার করে। ফলে, দ্বন্দ্বের বিষয়টি অমিমাংসিত থেকে যায়। যেমন, শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে যে সকল বিরোধেও বা দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু মালিক পক্ষের কাছে তুচ্ছ একটি বিষয়, বিষয়টি নিয়ে শ্রমিক পক্ষের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে মালিক পক্ষের সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশী হবে, বা দ্বন্দ্ব নিরসনে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সময় দরকার, তখন এড়িয়ে চলা কৌশল ব্যবহার করলে মালিক পক্ষ লাভবান হয়।

(৫) **সমঝোতাকরণ কৌশল (Compromising Strategy) ঃ** বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি বা মোকাবেলার সমঝোতাকরণ কৌশলে উভয় পক্ষের স্বার্থ যুক্ত করে এমন একটা সমাধান বের করা হয় যাতে উভয় পক্ষই সমান ভাবে জয় লাভ করে অথবা উভয় পক্ষই সমান ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বা পরাজিত হয়। এই কৌশলে কারো হার, কারো জিৎ হয় না। ফলে, উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট থাকে। যেমন, শিল্প দ্বন্দ্ব বা বিরোধের ক্ষেত্রে যে সকল দ্বন্দ্বে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের উদ্দেশ্য পারস্পারিক বর্জনীয় হয়, মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষ সমান শক্তিশালী হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে ঐক্যমত হচ্ছে না, মালিক পক্ষ অন্য কোন কৌশল ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না, বা যে কোন একটা অস্থায়ী সমাধান এখনই দরকার, তখন সমঝোতাকরণ কৌশল ব্যবহার করলে মালিক পক্ষ লাভবান হয়।

এবার শিল্প বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্প বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতিসমূহ

Methods for Resolving Industrial Conflcit or Dispute

যে কোন বিরোধ নিষ্পত্তি করার কতকগুলো সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি আছে। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য সেই একই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। সেগুলো এবার আলোচনা করা হবে।

১। বাধ্যকরণ [Forcing]

বাধ্যকরণ পদ্ধতিশিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার এমন একটি পদ্ধতি যেখানে এক পক্ষ অপর পক্ষকে শক্তি প্রয়োগ করে বা চাপ প্রয়োগ করে একটি সমাধান মেনে নিয়ে শিল্প বিরোধ মিমাংসা করতে বাধ্য করে। এই পদ্ধতিতে শক্তিশালী পক্ষ বলপ্রয়োগ, হুমকি-ধামকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা অন্য কোন প্রকার উপায়ে চাপ প্রয়োগ করে অন্য পক্ষকে একটি সমাধান জোর করে গ্রহণ করানোর মাধ্যমে শিল্প বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়। এটি শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার এক পক্ষীয়, স্বৈরতান্ত্রিক ও কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি। অবস্থা অনুকূলে থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা বা শ্রমিক সংঘ উভয়ই ব্যবহার করতে পারে।

২। দরকষাকষিকরণ [Bargaining]

দরকষাকষিকরণ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুই পক্ষ শিল্প বিরোধের বিষয় নিয়ে একটা সমঝোতায় পৌঁছায় ও একটি রফা চুক্তির মাধ্যমে শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি করে। এখানে দুই পক্ষ আন্তরিকতা ও পারস্পারিক আস্থা নিয়ে বিরোধীয় বিষয় নিয়ে তথ্য ও মতামত বিনিময় করে। একটি সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের ক্ষেত্রে মত পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করে এবং পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য উভয়ের কাছে সুবিধাজনক সমাধান বের করে শিল্প বিরোধের সমাধান করে। এটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি।

৩। মধ্যস্ততাকরণ [Mediating]

মধ্যস্ততাকরণ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার একটি তৃতীয় পক্ষীয় পদ্ধতি। যখন পক্ষগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে কোন সমাধান বের করতে ব্যর্থ হয়, তখন মধ্যস্ততাকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। উভয় পক্ষ সম্মতিক্রমে একজন তৃতীয় ব্যক্তি বা সংগঠনকে সালিশদার হিসেবে মেনে নিয়ে তার কাছে শিল্প বিরোধ মিমাংসা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সবার বক্তব্য শুনে তাঁর সর্বোচ্চ বিচার-বিবেচনা ব্যবহার করে একটি সমাধান প্রদান করেন। এ পদ্ধতিতে মধ্যস্ততাকারী যে সিদ্ধান্ত দেন তা পক্ষদ্বয় মেনে নিতে বাধ্য থাকে।

৪। সমস্যা সমাধানকরণ [Problem solving]

সমস্যা সমাধানকরণ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার একটি অগ্রকর্ম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিল্প বিরোধ উদ্ভব হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। ব্যবস্থাপনা সার্বিক অবস্থা বিশেষ করে শ্রমিক অধিকার ও স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে। শ্রমিক সংঘের সাথে মুক্ত যোগাযোগ বজায় রাখে। কোন বিষয়ে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়ার আগেই বিষয়টি সংশোধন করে শিল্প বিরোধ উদ্ভব হওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেয়। এটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এবার শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রাতিষ্ঠানিক উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রাতিষ্ঠানিক উপায়সমূহ

Institutional Measures for Settling Industrial Dispute

শিল্প বিরোধ কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে অভিপ্রেত হতে পারে না। কিন্তু তার পরেও শিল্প বিরোধ দেখা দেয়। শিল্প বিরোধ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যাহত করে, বাজার ক্ষতিগ্রস্ত করে, সুনাম নষ্ট করে ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক তিক্ত করে। তাই, শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি করা প্রতিষ্ঠানের ও এর সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য দরকার। এ লক্ষ্যে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির দুই ধরনের উপায় ব্যবহার করা হয়ঃ স্বেচ্ছামূলক বা অবিধিবদ্ধ উপায় ও বিধিবদ্ধ বা বাধ্যতামূলক উপায়। এই দু'টি উপায়ের অধীনে অনেকগুলো উপায় আছে যা এ সম্পর্কিত ছকে দেখানো হয়েছে।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রাতিষ্ঠানিক উপায়সমূহ

স্বেচ্ছামূলক বা অবিধিবদ্ধউপায়সমূহ

আচরণ বিধি
যৌথ পরামর্শ
অভিযোগ পদ্ধতি
শাস্তি প্রদান বিধি
তৃপক্ষীয় সম্মেলন
অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা
আলাপ-আলোচনা বা যৌথ দরকষাকষি
মধ্যস্ততা

বিধিবদ্ধ বা বাধ্যতামূলকউপায়সমূহ

অংশগ্রহণকারী কমিটি
আলাপ-আলোচনা বা যৌথ দরকষাকষি
সালিস
শ্রম আদালত
শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল
ধর্মঘট বা লক আউটের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা

আমরা সবগুলো উপায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে আলোচনা করব। পরবর্তীতে বিভিন্ন অধ্যায়ে এগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

স্বেচ্ছামূলক বা অবিধিবদ্ধ উপায়সমূহ

Voluntary or Nonstatutory Measures

সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় শিল্প বিরোধে নিয়োজিত পক্ষগণ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইন-আদালত না করে কতকগুলো উপায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বের করেছে ও সেগুলো ব্যবহার করে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করছে। সেই উপায়গুলোকে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির স্বেচ্ছামূলক বা অবিধিবদ্ধ উপায় বলা হয়। সেগুলো হলোঃ

১। আচরণ বিধি [Codes of Conduct] ঃ প্রতিটি সংগঠন সকল কর্মচারিদের জন্য সংগঠনের কাজকর্ম, আদব কায়দা, মূল্যবোধ, চলাফেরার ধরন, পোশাক, ভৌত সুবিধা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করে সাংগঠনের মধ্যে ভৌত ও মানবীয় পরিবেশগত শৃঙ্খলা বজায় রাখে। এ বিষয়ে সকলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তা মেনে চলতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই আচরণ বিধি সকল কর্মচারি মেনে চলার কারণে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় থাকে ও অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয় না। এটি একটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

২। যৌথ পরামর্শ [Joint Consultation] ঃ ব্যবস্থাপনাশ্রমিকদের বিষয় সংক্রান্ত কোন বিষয় উত্থিত হলে তা যৌথ পরামর্শ করার মাধ্যমে সমাধান করার ব্যবস্থা রেখে বিধি প্রণয়ন করতে পারে। এই যৌথ পরামর্শের জন্য একটা 'যৌথ পরামর্শ কমিটি' মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হতে পারে। এ বিধি অনুসারে মালিক বা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শ্রমিক বা শ্রমিক সংঘের কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে বা কোন পক্ষ কোন একটি নতুন সমস্যা উদ্ভুত হয়েছে বলে মনে করলে বা কোন একটা নতুন বিষয় প্রবর্তনের দরকার বোধ করলে তা যৌথ পরামর্শ কমিটিতে উত্থাপন করবে। কমিটি সে বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রফা করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে এবং কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করবে। এভাবে স্বেচ্ছামূলক উপায়ে সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে ও শিল্প বিরোধ দেখা দিবে না।

৩। অভিযোগ পদ্ধতি [Grievance Procedure] ঃ প্রতিটি মানুষ তার স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের কারণে চিন্তা, ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদিতে আলাদা। সে কারণে একই বিষয় নিয়ে একজন সন্তুষ্ট, অন্য একজন অসন্তুষ্ট হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে অভিযোগ নেই এমন কোন মানব সংগঠন কল্পনা করা যায় না। এখন জানা যাক অভিযোগ কী ? অভিযোগ হলো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয় থেকে উদ্ভূত যে কোন অসন্তোষ যা একজন কর্মচারি অন্যায়, অন্যায্য বা বৈষম্যমূলক বলে মনে করে, বিশ্বাস করে বা অনুভব করে (জুসিয়াস, ১৯৭১)। অভিযোগ নিষ্পত্তি না হলে ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে ও তা শিল্প বিরোধের কারণ হয়। এ জন্য প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ জানানো ও নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি রাখা হয় ও তা সকলকে অবহিত করা হয়। যে কোন অভিযোগের সন্তোষজনক সমাধান করলে কর্মী সন্তুষ্ট হয় ও শিল্প বিরোধ দেখা দেয় না।

৪। শাস্তি প্রদান বিধি [Disciplinary Procedure] ঃ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, কার্যপদ্ধতি, আচরণ বিধি মেনে চলা প্রত্যেক কর্মচারির কর্তব্য। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রবর্তিত বিধি-বিধান মেনে না চললে বা তার ব্যত্যয় ঘটালে যথাযথ তদন্ত করে শাস্তি প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে, প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে ও শিল্প বিরোধ দেখা দেয়ার সুযোগ থাকে না।

৫। ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন [Tripatile Conference] **ঃ** সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠান বহির্ভুত কোন কারণে যেমন অন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন নিয়ে বিরোধ, রাজনৈতিক কারণে বিরোধ , সামাজিক ও পরিবেশ নিয়ে বিরোধ ইত্যাদি কারণে শিল্প বিরোধ দেখা দেয়ার অবস্থা হলে বা ধর্মঘট হলে তা সমাধানের জন্য ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন একটি স্বেচ্ছামূলক ও কার্যকর শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়। মালিক, শ্রমিক সংঘ ও শ্রমিক সংঘ ফেডারেশন বা মালিক সমিতি ফেডারেশন বা সরকার নিয়ে এই ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ভাবে সমস্যার সমাধান হলে আর শিল্প বিরোধ দেখা দেয়ার সুযোগ থাকে না।

৬। অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা [Participatory Management] ঃ অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনাশিল্প বিরোধ প্রতিরোধের একটি কার্যকর বহুল ব্যবহৃত সর্বজন গ্রাহ্য স্বেচ্ছামূলক শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তির উপায় হিসেবে স্বীকৃত। ব্যবস্থাপনা বা মালিক স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মচারিদের অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে পারে। এই ব্যবস্থাকে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা বলে।প্রতিষ্ঠানেরসর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্তৃপক্ষ পরিচালনা পর্ষদে শ্রমিকদের প্রতিনিধি রাখা থেকে শুরু করে ইউনিট পর্যায়ে এই প্রতিনিধি রাখা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে কর্মচারিদের স্বার্থ বা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিক পক্ষ সক্রিয় ভাবে জড়িত থাকে বিধায় কোন রকম অসন্তোষ থাকে না। ফলে, শিল্প বিরোধ দেখা দেয়ার সুযোগ থাকে না।

৭। যৌথ দরকষাকষি [Collective Bargaining] ঃ যৌথ দরকষাকষি হলো শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা একত্রে বসে শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সন্ধির লক্ষ্যে আলোচনা করে। মালিক পক্ষ বা নিয়োগ কর্তার সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারিদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের কোন বিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধির বোঝাপড়াকে যৌথ দরকষাকষি বলা হয়। এখানে উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তি বের করে শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়।

৮। মধ্যস্থতা [Arbitration] ঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর ধারা ২০৯(১০) অনুসারে মধ্যস্থতা একটি স্বেচ্ছামূলক শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়। এই ধারায় বলা হয়েছে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় যদি সালিসী কার্যক্রম ব্যর্থ হয়, তা হলে সালিসী ব্যর্থ হওয়ার সনদ নিয়ে পক্ষগণ একমত হয়ে স্বইচ্ছায় উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন একজন মধ্যস্থতাকারীর নিকট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যেতে পারে। এই মধ্যস্থতাকারী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মধ্যস্থতাকারীদের তালিকা হতে যে কোন একজন, যাকে পক্ষগণ পছন্দ করবেন, হতে পারে অথবা পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য যে কোন ব্যক্তি হতে পারবেন। মধ্যস্থতাকারী মধ্যস্থতার অনুরোধ পাওয়ার দিন থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে অথবা পক্ষগণ কর্তৃক লিখিত ভাবে স্বীকৃত কোন বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাঁর রায়দান প্রদান করবেন। মধ্যস্থতাকারী তার রায়ের কপি পক্ষগণকে ও সরকারকে প্রদান করবেন। মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় চূড়ান্ত হবে ও এর বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না।

বিধিবদ্ধ বা বাধ্যতামূলক উপায়সমূহ

Compulsory or Statutory Measures

১। অংশগ্রহণকারী কমিটি [Participation Committee] ঃ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ এর ধারা ২০৫ অনুসারে অন্যুন পঞ্চাশ জন শ্রমিক কর্মরত আছে এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে মালিক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় তার প্রতিষ্ঠানে

একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করবেন। মালিক ও শ্রমিকদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি প্রধানতঃ শিল্প বিরোধ যাতে দেখা না দেয় সে জন্য পারস্পারিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করবে, শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করবে,শৃংখলাবোধে উৎসাহিত করবে, নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা করবে এবং কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে। ফলে, শিল্প বিরোধ দেখা দেয়ার সুযোগ পাবে না। তবে, একবার শিল্প বিরোধ দেখা দিলে এই কমিটির কোন কাজ নেই।

২। যৌথ দরকষাকষি [Collective Bargaining] ঃ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ -তে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাধ্যতামূলক যৌথ দরকষাকষির বিধান আছে। ধারা ২১০ (১)ঃ যদি কোন সময়ে কোন মালিক বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা এজেন্ট দেখতে পায় যে, মালিক বা শ্রমিকগণের মধ্যে কোন বিরোধ উত্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা হলে উক্ত মালিক বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি তার অভিমত ব্যক্ত করে অন্য পক্ষকে লিখিত ভাবে জানাবেন। লিখিত পত্র প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে পত্র প্রাপক , অন্য পক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে, পত্রে উত্থাপিত বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যৌথ দরকষাকষি শুরু করার জন্য তার সাথে একটি সভার ব্যবস্থা করবেন, এবং এইরূপ সভা এতদ্ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উভয় পক্ষের প্রতিনিধির মধ্যেও অনুষ্ঠিত হতে পারবে। [ধারা-২১০ (২)] যদি পক্ষগণ উক্তরূপ আলোচনার পর আলোচিত বিষয়ের উপর কোন নিষ্পত্তিতে উপনীত হন, তা হলে একটি নিষ্পত্তিনামা লিখিত হবে এবং তাতে পক্ষদ্বয় দস্তখত করবেন, এবং তার একটা কপি মালিক কর্তৃক সরকার , শ্রম পরিচালক এবং সালিসের নিকট পাঠাতে হবে। [ধারা-২১০ (৩)]

৩। সালিস [Conciliation] ঃ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩-তে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাধ্যতামূলক সালিস করার ব্যবস্থা আছে। যদি ধারা -২১০(১)এর অধীন প্রেরিত কোন পত্রের প্রাপক অন্য পক্ষের সাথে ধারা- ২১০(২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সভার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে উক্ত অন্য পক্ষ, অথবা উভয় পক্ষের পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম সভার তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে অথবা উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতি অনুযায়ী বর্ধিত সময়ের মধ্যে কোন সিম্পত্তিতে উপনীত হওয়া না যায়, তা হলে যে কোন পক্ষ উপযুক্ত সালিসকে অবহিত করতে পারবেন এবং বিরোধটি সালিসীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য তাকে লিখিত ভাবে অনুরোধ করতে পারবেন। [ধারা-২১০ (৪)] সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার সালিস নিযুক্ত করবে সালিসীর জন্য কোন অনুরোধ গেজেটে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট এলাকা বা প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য নিযুক্ত সালিস গ্রহণ করবেন [ধারা-২১০ (৫)]। উক্ত লিখিত অনুরোধ পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে সালিস, তার সালিসী কার্যক্রম শুরু করবেন, এবং বিরোধ স্পিত্তির জন্য উভয় পক্ষের সভা আহ্বান করবেন [ধারা-২১০ (৬)]। বিরোধের পক্ষগণ স্বয়ং অথবা তাদের মনোনিত এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তি সম্পাদন করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সালিস এর নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে হাজির হবেন [ধারা-২১০ (৭)]।

যদি সালিসীর ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি হয় তা হলে, সালিস তৎসম্পর্কে সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করবেন, এবং এর সাথে উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিষ্পত্তি নামার একটি কপিও প্রেরিত হবে [ধারা-২১০ (৮)]।

৪। শ্রম আদালত [Labour Court] ঃ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ -তে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম আদালতে যাওয়ার বিধান আছে। যদি কোন ধর্মঘট বা লক -আউট শুরু হয়ে যায়, তা হলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য বিরোধে জড়িত যে কোন পক্ষ শ্রম আদালতে দরখাস্ত পেশ করতে পারবে [ধারা-২১১ (২)]। কোন ক্ষেত্রে সরকার কোন ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সরকার তৎক্ষণাৎ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদারতে প্রেরণ করবে [ধারা-২১১ (৫)]। শ্রম আদালত বিরোধের উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব, বিরোধটি এর নিকট প্রেরণের তারিখ হতে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে তার রোয়েদাদ প্রদান করবে [ধারা-২১১ (৬)]। শ্রম আদালতের কোন রোয়েদাদ তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা, যা দুই বছরের অধিক হবে না, পর্যন্ত বলবৎ থাকবে [ধারা-২১১ (৭)]।

৫। শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল [Labour Appellate Tribunal] ঃ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ -তে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতের রায়ে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আপীল করতে চাইলে বাধ্যতামূলক শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল যাওয়ার বিধান আছে। শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ,বা দন্ডের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায় প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারবে, এবং উক্ত আপীলের

ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে [ধারা-২১৭]। ট্রাইব্যুনাল আপীলে শ্রম আদালতের কোন রায়, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ,বা দন্ডাদেশ বহাল রাখতে, সংশোধন বা পরিবর্তন করতে বা বাতিল করতে পারবে অথবা মামলাটি পুনরায় শুনানীর জন্য শ্রম আদারতে ফেরত পাটাতে পারবে; এবং অন্যত্র ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে, ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন প্রদত্ত শ্রম আদালতের সকল ক্ষমতাও প্রয়োগ করবে [ধারা-২১৮ (১০)]। ট্রাইব্যুনালের রায় আপীল দায়ের করবার অনধিক ষাট দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে [ধারা-২১৮ (১১)]।

ট্রাইব্যুনালের রায় আদালত কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে কার্যকর হবে, এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ, যা দুই বছরের অধিক হবে না, পর্যন্ত বলবৎ থাকবে[ধারা-২২৩ (৪)]।

৬। ধর্মঘট বা লক আউটের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা [Injunction on Strike or Lock out by the Government] ঃ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ এর বিধান মতে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সরকার ধর্মঘট বা লক আউটের উপর নিষেধাজ্ঞদিতে পারে। যদি কোন ধর্মঘট বা লক -আউট ত্রিশ দিনের বেশী স্থায়ী হয়, তা হলে সরকার , লিখিত আদেশ দ্বারা তা নিষিদ্ধ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত ত্রিশ দিনের পূর্বে ও যে কোন সময়ে, লিখিত আদেশ দ্বারা কোন ধর্মঘট বা লক -আউট নিষিদ্ধ করতে পারবে, যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্তরূপ অব্যাহত ধর্মঘট বা লক-আউট জনজীবনে সাংঘাতিক কষ্টের কারণ হয়েছে বা এটা জাতীয় স্বার্থের হানিকর [ধারা-২১১ (৩)]। কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকার, এতে কোন ধর্মঘট বা লক-আউট শুরু হবার পূর্বে অথবা পরে যে কোন সময়, লিখিত আদেশ দ্বারা তা নিষিদ্ধ করতে পারবে[ধারা-২১১ (৪)]।

কোন ক্ষেত্রে সরকার কোন ধর্মঘট বা লক-আউট কোন ধর্মঘট বা লক-আউটনিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সরকার তৎক্ষণাৎ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদারতে প্রেরণ করবে। [ধারা-২১১ (৫)]

এবার বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনারজন্য কতিপয় ইশারা বা টিপস্ নিয়ে আলোচনা করব।

বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার জন্য ইশারা বা হুশিয়ারি

Tips for Managing Conflict

বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা একটি জটিল ও ঝুকিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। যে কোন দ্বন্দ্বের ন্যূনতম দু'টি পক্ষ থাকে। আবার বহু পাক্ষিক দ্বন্দ্বও হতে পারে। অপর পক্ষের মনোভাব-মতলব-কৌশল বোঝা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার নিজের মেজাজ-মর্জি-অবস্থানও অনেক সময় ঠিক রাখা যায় না, এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। চরম একটা অনিশ্চয়তা এই বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনায় বিরাজ করে। এমতাবস্থায়, বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার পক্ষগণের জন্য কতকগুলো ইশারা বা হুশিয়ারি অনুসরণ করা যেতে পারে। এগুলো অনুসরণ করলে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনায় সুফল পাওয়া যাবে। এই ইশারা বা হুশিয়ারিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **দ্বন্দ্বকে মেনে নিন (Accept conflict) ঃ** দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক এবং সকল সম্পর্কের মধ্যেই ঘটে থাকে। যেহেতু দ্বন্দ্ব এড়ানো যায় না, তাই দ্বন্দ্বকে মেনে নিয়ে এর ব্যবস্থাপনা শিখতে হবে। তবে, দ্বন্দ্ব নিরসন করা যাবে না যদি না উপযুক্ত সক্ষম ব্যক্তি এখানে নিয়োজিত না হয়।

২। **মাথা ঠান্ডা রাখুন (Be a calming agent) ঃ** মনে রাখা দরকার, আপনার যে কোন আচরণ ,ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া দ্বন্দ্বের তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে, আবার কমিয়েও দিতে পারে। তাই , মাথা ঠান্ডা রাখুন। একটি গঠনমূলক উদ্দেশ্য ঠিক করুন। অপর পক্ষের সাথে কিভাবে কাজ করবেন, তার পরিকল্পনা করুন।

৩। **সক্রিয় মনোযোগের সাথে শুনুন (Listen actively) ঃ** নিজেকে ভালো ভাবে সক্রিয় মনোযোগের সাথে শুনুন। নিজের অনুভূতি কি, নির্দিষ্ট সমস্যাটি কি, সমস্যাটি আপনার উপর কি প্রভাব রাখতে পারে, আপর পক্ষের কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন ইত্যাদি নিয়ে নিজে ভাবনাটা সুনির্দিষ্ট করুন।

৪। **দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করুন (Analyze the conflict) ঃ** দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করে বের করুন - কি বিষয় দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে? কে আপনাকে উত্তেজিত করেছে ? কি চেয়ে আপনি পাননি ? কি জিনিস আপনি হারাতে ভয় পাচ্ছেন ? আপনার অবস্থান কি সঠিক ? আপনি দ্বন্দ্বকে অতিরঞ্জিত করে দেখছেন কি ? কি সমাধান আপনি চাচ্ছেন ? ইত্যাদি। দ্বন্দ্বের এ বিষয়গুলো আপনাকে দ্বন্দ্ব নিরসনে সঠিক পথ দেখাবে।

৫। **নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করুন** (Model neutral language) ঃ দ্বন্দ্বে নিয়োজিত মানুষ উত্তেজিত থাকে। তারা জ্বালাময়ী শব্দ ব্যবহার করে বা ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে। ফলে, দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়। সে জন্য আবেগ বঞ্চিত, উদ্দেশ্যমুখী নিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করুন। দ্বন্দ্ব নিরসনের দিকে যান। তা না হলে, দ্বন্দ্ব আরো জটিল হবে। মনে রাখতে হবে- রেগে গেলেন, তো হেরে গেলেন।

৬। **সমস্যাকে ব্যক্তি থেকে আলাদা করুন** (Separate the person from the problem)ঃ সমস্যাকে একটা অবস্থা বা নির্দিষ্ট আচরণ হিসেবে দেখুন। অপর পক্ষের ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ মনোভাবকে দায়ী করবেন না। তাই, সমস্যাকে ব্যক্তি থেকে আলাদা করুন। সমস্যা সমাধান সহজ হবে, সম্ভব হবে।

৭। **এক সাথে কাজ করুন** (Work together) ঃ প্রতিপক্ষের সাথে এক সঙ্গে কাজ করুন। পরস্পরকে দোষারোপ করা বন্ধ করুন। পরস্পরের কথা শুনুন। এক সাথে সমস্যার সমাধানে অঙ্গীকার করুন।

৮। **ভিন্নমত গ্রহণে সম্মত হন** (Agree to disagree) ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব মত আছে। কোন বিষয়ের সব কিছুতে দুই ব্যক্তির পক্ষে একমত হওয়া দুর্লভ ঘটনা। তাই, ভিন্নমত গ্রহণে সম্মত হোন। মনে রাখতে হবে, যা সঠিক তা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং মুক্ত মনে সমাধান খুঁজুন, সঠিক খোঁজার আবর্তে পড়বেন না।

৯। **ভবিষ্যতের উপর আলোকপাত করুন** (Focus on the future) ঃ দ্বন্দ্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ অতীতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অপদস্ত করা ছোটখাটো ঘটনা ও কথা নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকে। ফলে, বর্তমান সমস্যার সমাধান কি হবে এবং ভবিষ্যতে উদ্ভুত হতে পারে এমন সমস্যা আর দেখতে পায় না। তাই, দ্বন্দ্বের সমাধান চাইলে অতীত ত্যাগ করুন, সামনে তাকান। ভবিষ্যতের উপর আলোকপাত করুন এবং সমাধান খুঁজুন।

১০। **আগের অবস্থান ছেড়ে আসুন** (Move past positions) ঃ দ্বন্দ্বের সমাধান চাইলে আগের অবস্থান ছেড়ে আসতে হবে। কোন একটা পূর্ব- অবস্থানে অনড় থাকলে দ্বন্দ্বের নিরসনে অচলবস্থা দেখা দিবে। তাই, দ্বন্দ্বে নিয়োজিত প্রত্যেক পক্ষেরই দ্বন্দ্ব নিরসনে আগের অবস্থান ছেড়ে আসতে হবে।

১১। **নিজ স্বার্থের বিষয়গুলো ভাগাভাগি করুন** (Share your interests) ঃ দ্বন্দ্ব নিরসনের আলোচনায় সকল পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারে চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য পক্ষদের নিজ প্রকৃত স্বার্থ,তথ্য ও প্রমাণাদি পরস্পরকে বলতে ও দেখাতে হবে। এ সবের খোলামেলা বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত পক্ষগণের কাছে দ্বন্দ্বের একটা ভারসাম্যমূলক সমাধান পাওয়া যাবে। তাই, নিজ স্বার্থের বিষয়গুলো ভাগাভাগি করুন ও দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে দ্বন্দ্বের গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করুন।

১২। **সৃষ্টিশীল হন** (Be creative) ঃ দ্বন্দ্বে নিয়োজিত সকল পক্ষের প্রয়োজন মিটানোর মত উপযুক্ত সমাধান পেতে হলে পক্ষগণকে সৃষ্টিশীল ও কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। বাঁধাধরা গন্ডীর বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে হবে। সমস্যা আপতঃ এড়ানোর জন্য সমাধান দিলে চলবে না। গঠনমূলক ও টেকসই সমাধান কাম্য। তাই, চিন্তায় সৃষ্টিশীল হন ও সবার কাছে সন্তোষজনক সমাধান বের করুন।

১৩। **সুনির্দিষ্ট হন**(Be specific) ঃ দ্বন্দ্ব নিরসনের সমাধান এমন শব্দে ও বাক্যে লিখতে হবে যেন তার একটাই অর্থ হয়, দ্ব্যর্থবোধক না হয় এবং সকলে প্রত্যেকটি অংশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। অতএব, সমাধান লেখায় বা বলায় সুনির্দিষ্ট হন।

১৪। **গোপনীয়তা বজায় রাখুন** (Maintain confidentiality) ঃদ্বন্দ্বে জড়িত ব্যক্তি বা পক্ষগণের সাথে সরাসরি কথা বলতে হবে। তৃতীয় পক্ষকে ঢুকতে দিলে দ্বন্দ্ব বাড়ে, গুজব তৈরি হবে ও দ্বন্দ্বের বা বিরোধের সমাধান জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে। অতএব, দ্বন্দ্ব নিরসনের আলোচনার কথাবার্তার গোপনীয়তা বজায় রাখুন, সহজে সমাধান পাবেন।

সারসংক্ষেপ:

বিরোধ নিষ্পত্তির কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির পাঁচটি কৌশল

আছে। সেগুলো হলো -একীভুতকরণ কৌশল, কৃতার্থকরণ কৌশল, দমনকরণ কৌশল, এড়িয়ে চলা কৌশল ও সমঝোতাকরণ কৌশল।শিল্প বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতিসমূহ হচ্ছে বাধ্যকরণ, দরকষাকষিকরণ, মধ্যস্ততাকরণ ও সমস্যা সমাধানকরণ। বিরোধ নিষ্পত্তির কতকগুলো স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক পদ্ধতি আছে। এজন্য কতকগুলো পরামর্শ বা টিপস্ আছেযা অনুসরণ করলে সাফল্য লাভ করা যাবে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১। বিরোধ বা দ্বন্দ্ব কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
২। শিল্প বিরোধ ধারণাটির সংজ্ঞা দিন।
৩। শিল্প বিরোধের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।
৪। শিল্প বিরোধের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৫। শিল্প বিরোধের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৬। শিল্প বিরোধ প্রকাশের ধরন বা পদ্ধতিসমূহ বলুন।
৭। শিল্প বিরোধের ধনাত্মক প্রভাব বর্ণনা করুন।
৮। শিল্প বিরোধের ঋণাত্মক প্রভাব বর্ণনা করুন।
৯। বিরোধ বা দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করার কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
১০। শিল্প বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিস্পত্তিকরণ পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করুন।
১১। শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি করার প্রাতিষ্ঠানিক উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
১২। বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার জন্য ইশারা বা টিপস্গুলো বর্ণনা করুন।